দৈনিক জনকন্ঠ
১২ জুলাই, ২০১০
পৃষ্ঠা – ০৭
শ্রেণী সংখ্যা – ০৭০.৪০৮

জনকন্ঠ পৃ: ৭ ১২.০৭.১০

মাদক ॥ এক ভয়াল ছোবল

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের অনেকের কাছে মাদক বিনোদনমূলক বস্তু। মাদক গ্রহণ করে আনন্দঘন সুখকর ইওফোরিয়াতে ভোগা মাদকসেবীদের কাছে এক আকর্ষণীয় অনুভূতি। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এড্‌ভেঞ্চারিজমে ভোগে। দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ বা কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্যের পাশাপাশি হরেক রকম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন চিন্তাশক্তি অর্জন, স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী জীবনযাপন, ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এরা মুখ্য ভূমিকা পালনে তৎপর ও আগ্রহী হয়। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এড্‌ভেঞ্চারিজমের অংশ হিসেবে জীবনের কোন না কোন সময়ে এরা ধূমপান, এ্যালকোহল পানসহ মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। উঠতি বয়সের এসব ছেলেমেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গদোষে এসব বদ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে।

স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই নানাবিধ সমস্যায় ভোগে, জর্জরিত হয় এবং এসব সমস্যা সমাধানে বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছ থেকে কার্যকর ও সময়োপযোগী সাহায্য-সহযোগিতা এবং সমর্থন না পেয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমস্যার সমাধান না পেয়ে দিনের পর দিন এদের হতাশা বাড়তে থাকে এবং স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম থেকে এরা আস্তে আস্তে দূরে সরে পড়ে। অবজ্ঞা, অবহেলা, ব্যর্থতা, হতাশা এদের কর্মবিমুখ করে তোলে এবং জীবনের প্রতি এদের ভালবাসা বা আগ্রহ দিন দিন লোপ পেতে থাকে। উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি, কর্মক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, একাগ্রতা থাকা সত্ত্বেও যথাযোগ্য সাফল্য না পেলে বা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উল্লেখিত এইসব গুণাবলীর মূল্যায়ন না হলে জীবনের প্রতি এরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। যা মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বা জাতিতে জাতিতে বৈষম্য ও হতাশার অন্যতম কারণ। পেশা বা চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, রোগ-বিমারিতে ভোগা, অভাব-অনটনসহ আরও অসংখ্য কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নিত হতে পারে। যে কোন কারণেই হোক না কেন, হতাশা, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার পরিমাণ অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেলে অবমুক্তির পন্থা হিসেবে মানুষ বিভিন্ন অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী পথ অবলম্বন করে থাকে। তার মধ্যে আত্মহত্যা একটি। অনেক মানুষ এ চরম সিদ্ধান্তে না গিয়ে হতাশা-দুঃখ-কষ্ট ভোলার মাধ্যম হিসেবে মাদকদ্রব্যকে সঙ্গী করে নেয়। তারা ভাবে মাদক ও মাদকাসক্তি এদের সব সমস্যা দূর করবে। অনেক দেশে মাদক ব্যবসায়ীদের ভাড়া করা মাদক প্রমোটার থাকে। এসব ভাড়া করা প্রমোটার উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধির মাধ্যমে মাদকের প্রতি আসক্ত করে তোলে। তারা প্রথমদিকে গাঁটের পয়সা খরচ করে বা বিনে পয়সায় বিড়ি-সিগারেটসহ মাদক সরবরাহের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের আকৃষ্ট করে এবং পরবর্তীতে দিনের পর দিন মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে আসক্তি সৃষ্টির কারণে মাদকের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তোলে। একবার আসক্ত হয়ে পড়লে মাদকসেবীগণ মাদক গ্রহণ না করে আর থাকতে পারে না। পরিণামে যে কোন কিছুর বিনিময়ে মাদকদ্রব্য সংগ্রহে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ অসহায় অবস্থার সদ্ব্যবহার করে মাদক ব্যবসায়ীগণ প্রচুর টাকা উপার্জন করে। দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণের ফলে শরীর ও মনে ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া শুরু হয়। দীর্ঘকাল মাদক অপব্যবহারের কারণে মানুষের শরীর ও মস্তিষ্কে ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও কর্মকাণ্ডে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। মাদকদ্রব্য অতি দ্রুত আসক্তির সৃষ্টি করে এবং আসক্তির ফলে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির কারণে দীর্ঘকাল ব্যবহারে মানুষ স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। প্রতিটি মাদকদ্রব্যের প্রধান কাজ মস্তিষ্কের ওপর এবং সেটি হলো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে নিস্তেজ বা অবশ করে দেয়া। ঘুম ঘুম ভাব থাকলেও মাদকসেবীদের ভাল ঘুম হয় না। এদের প্রায় বমি হয়, লিভারে প্রদাহ দেখা দেয়। দিনের পর দিন মাদক গ্রহণের ফলে মাদকসেবীদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে সাধারণ সংক্রামক রোগেও ওষুধ কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে ক্যানসার ও হৃদরোগের ঝুঁকি বহু গুণ বেড়ে যায়।

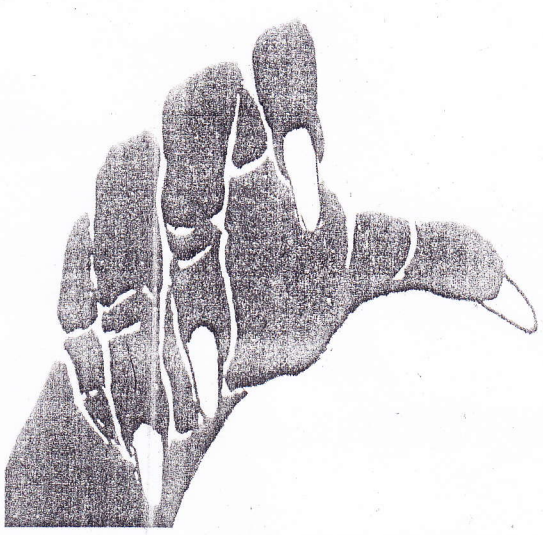

আসক্তি সৃষ্টির কারণে সাবকন্‌সাস অবস্থায় থাকে বলে মাদকসেবীরা প্রায় দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে মাদকদ্রব্য মানুষের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা নষ্ট করে দেয়। যুবক-যুবতীদের মাদকাসক্তির কারণে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবারের কোন সদস্য মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে সে পরিবার সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়। কারণ মাদকসেবীরা পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি ছাড়াও সমাজে সন্ত্রাস, রাহাজানি, খুনখারাবিতে জড়িয়ে পড়ে। মাদকদ্রব্য কেনার পয়সা সংগ্রহের জন্য চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, খুন-জখমে এরা প্রায়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মাদক গ্রহণে দূষিত সিরিঞ্জ ব্যবহারের ফলে এইড্‌স রোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। মাদকসেবীদের জানা আবশ্যক, মাদক গ্রহণে বিন্দুমাত্রও উপকারিতা নেই বরং মাদক যেন মানুষের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা হাতে সাক্ষাত এক যমদূত। মাদক মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে তোলে, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে, মূল্যবোধ ধ্বংস করে, আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ নষ্ট করে, মানুষের মনুষ্যত্বকে কেড়ে নেয়।

১৯৮৯ সালে পরিচালিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে মাদকসেবীর সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। শোনা যায়, বর্তমানে এ সংখ্যা আরও বহুগুণ বেড়েছে, যদিও মাদকসেবীদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কারও কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। ওই পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়, মাদক গ্রহীতাদের ১৫ শতাংশের বয়স ২০-এর নিচে, ৬৬ শতাংশ ২০-৩০ বছরের মধ্যে, ১৬ শতাংশ ৩০-৪০ বছর এবং ৪ শতাংশ ৪০ থেকে তদুর্ধ বয়সের। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য উৎপাদিত হয় না। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সব ধরনের স্মাগলিং এবং মাদকদ্রব্য পাচারের ট্রাজিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এবার একটি সংক্ষিপ্ত মাদক পরিচিতি উপস্থাপন করছি। অপিয়াম পপি থেকে প্রাপ্ত অপরিশোধিত ক্ষয়িত পদার্থকে অপিয়াম বলা হয়। অপিয়ামকে পৃথক ও পরিশুদ্ধ করলে বিশটি ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বস্তুটির নাম মরফিন। কোডেইন অপিয়াম থেকে প্রাপ্ত অন্য একটি প্রাকৃতিক উপাদান। হেরোইন প্রাকৃতিক উপাদান নয়। মরফিনের রাসায়নিক রূপান্তর ঘটিয়ে হেরোইন প্রস্তুত করা হয়। পেথিডিন বহুল পরিচিত একটি সিন্‌থেটিক ওষুধ। ঘুম আনয়নে এবং মাংসপেশীর খিঁচুনি উপশমকারী হিসেবে পেথিডিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কোকেইনের সামাজিক ব্যবহার এবং অপব্যবহার সর্বজনবিদিত। অন্যান্য মাদকের মতোই কোকেইন আসক্তি, নির্ভরশীলতা, মাদক প্রত্যাহারজনিত বিষণ্ণতা এবং মানসিক পীড়া সৃষ্টি করে। অ্যাম্‌ফেটেমাইন ইওফোরিয়াও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে বলে বিশ্বজুড়ে এ উপাদানটির মারাত্মক অপব্যবহার হচ্ছে। ক্যানাবিস গ্রুপের মারিজুয়ানা, হাসিস, টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল, এলএসডি, বার্বিচ্যুরেটস এবং এ্যালকোহল মাদকদ্রব্যের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। মাদক হিসেবে বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে পরিচিত নামটি হলো ফেনসিডিল, যা মাদকসেবীদের কাছে সংক্ষেপে ডাইল হিসেবে পরিচিত। ফেনসিডিল মিষ্টিযুক্ত কাশির সিরাপ হিসেবে মে এন্ড বেকার প্রস্তুত করত। ১৯৮২ সালের ওষুধনীতির আওতায় বাংলাদেশে ফেনসিডিল বাতিল ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশে ফেনসিডিলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলেও পাশের দেশ ভারত থেকে প্রতিদিন সীমান্ত পার হয়ে প্রচুর পরিমাণ ফেনসিডিল বাংলাদেশে ঢুকছে। তবে ওষুধ হিসেবে নয়, মাদক হিসেবে। প্রতি পাঁচ মিলিলিটার ফেনসিডিল সিরাপে রয়েছে ৯ মিলিগ্রাম কোডেইন ফস্‌ফেট, ৭২ মিলিগ্রাম এফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং ৩৬ মিলিগ্রাম প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড। কাশির ওষুধ হিসেবে স্বাভাবিক ডোজ হলো প্রতিবার এক থেকে দুচামচ বা পাঁচ থেকে দশ মিলিলিটার। মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে ফেনসিডিলের ব্যবহারে আসক্তি তৈরি হয়। এ কারণে যুবক-যুবতী বা মাদকসেবীরা সস্তা ও সহজলভ্য বলে ফেনসিডিলে আসক্ত হয়ে পড়ে। ফেনসিডিল নিয়ন্ত্রণ বর্তমানকালের এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ইয়াবা অন্যান্য নেশা ও শরীরের ক্ষতিসাধনকারী একটি ভয়ঙ্কর মাদকদ্রব্য। ইয়াবা মিথাইল অ্যাম্‌ফিটামিন বা মেথাম্‌ফিটামিন এবং ক্যাফিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশ্রণ। ক্যাফিন আমাদের কাছে অতি পরিচিত একটি বস্তু। চা ও কফিতে ক্যাফিন থাকে। ক্যাফিন মৃদু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম উত্তেজক। তন্দ্রা দূর করার জন্য সাধারণত আমরা ক্যাফিনসমৃদ্ধ চা বা কফি পান করি। কর্মক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চা বা কফি অনেকের জন্য উপকারী। মিথাইল অ্যাম্‌ফিটামিন অত্যন্ত শক্তিশালী নেশা সৃষ্টিকারী একটি মস্তিষ্ক উত্তেজক বা উদ্দীপক। থাইল্যান্ডে ইয়াবাকে ক্রেইজি মেডিসিন হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইয়াবা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইয়াবা সাধারণত ট্যাবলেট বা পিল আকারে প্রস্তুত করা হয়। ট্যাবলেটের রং হয় অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয়। ট্যাবলেট প্রস্তুতে মূলত লাল গোলাপী এবং সবুজ রং ব্যবহার করা হয়। ট্যাবলেটের আকর্ষণ ও কাটতি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রংয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ফলের ফ্লেভার বা সুগন্ধি যোগ করা হয়। ইয়াবা ট্যাবলেটে 'আর' এবং 'ডব্লিউওয়াই' লোগো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইয়াবা মুখে খাওয়া হয়। ইয়াবা ট্যাবলেটে প্রায়ই আঙ্গুর, কমলা এবং ভেনিলা ক্যান্ডির স্বাদ থাকে বলে ইয়াবা মুখে খাবার ব্যাপারে মাদকসেবীদের আগ্রহ থাকে বেশি। ইয়াবা গ্রহণের আরও একটি সহজ পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতির নাম চেজিং। এই পদ্ধতিতে ইয়াবা মরফিন বা হেরোইনের মতো এ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে রেখে মাদকের তলা দিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। আগুনের উত্তাপে মাদক গলে যায় এবং বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প মাদকসেবীরা নাক বা মুখ দিয়ে শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে টেনে নেয়। অনেক সময় মাদকসেবীরা ট্যাবলেটকে ভেঙ্গে পাউডার তৈরি করে নাক দিয়ে শ্বাসের মাধ্যমে সজোরে শরীরের ভেতর টেনে নেয় অথবা এই পাউডার দ্রাবকের সঙ্গে মিশিয়ে ইনজেক্‌শনের মাধ্যমে শরীরে গ্রহণ করে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কমবেশি মাদক সমস্যা বিদ্যমান। বাংলাদেশেও মাদক ও মাদকাসক্তি এক জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ মাদকসেবী কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতী। যে যুব সমাজের ওপর দেশের শিক্ষাদীক্ষা, উন্নতি, অগ্রগতি ও ভবিষৎ নির্ভরশীল, তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ যদি মাদকাসক্তিতে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, তবে সে দেশের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এ ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে আমাদের যুবকসমাজকে রক্ষা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

এক. অধিকাংশ স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা না ভেবেই বা না জেনেই মাদক গ্রহণ শুরু করে। তারা জানে না, আসক্তি ও নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়ে গেলে মাদক প্রত্যাহার সহজ নয় এবং মাদক প্রত্যাহারের মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বাবা, মা, ভাইবোন আত্মীয়স্বজন বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পর্যাপ্ত ধারণা দেয়া আবশ্যক।

দুই. মাদক গ্রহণ সমস্যা যত না সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়, তার চেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী বা উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের যাবতীয় সমস্যা বিবেচনায় নেয়া উচিত। প্রয়োজনবোধে বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে সন্তান-সন্ততির সঙ্গে বাবা-মা বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দূরত্ব বেশি। দূরত্বের কারণে প্রায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধাবোধের অবনতি ঘটে। মাদকাসক্তির পেছনে এসব ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিন. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন জনসমাবেশে মাদক গ্রহণের কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে নিয়মিত সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করা বাঞ্ছনীয়। মাদক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রগুলোর কার্যকর ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

চার. বাংলাদেশে মাদক ও মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব আরও ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছার আগেই জরুরী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য সরকার এনজিওর সাহায্য নিতে পারে। সার্কভুক্ত সব দেশেই বিশেষ করে পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালে মাদক সমস্যা গুরুতর বলে আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মাদক নিয়ন্ত্রণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। চোরাচালান বন্ধের জন্য সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে কঠোরতা দরকার।

পাঁচ. মাদকসেবীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন একটি জটিল, ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কার্যকরভাবে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা গেলে আশা করা যায় এ অন্ধকার অপরাধ জগৎ থেকে অনেকেই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার অনুপ্রেরণা পাবে।

লেখক: প্রফেসর, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
drmuniruddin@yahoo.com

East West University
LIBRARY
43, Mohakhali, C/A